এনার্জি বাংলা

রেজি নং : ডিএ-১২৯, ঢাকা, শনিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৪২৬, ৭ই ডিসেম্বর ২০১৯, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মূল্য ২০ টাকা

আতশবাজির আলোকচ্ছটার এমন আলো ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে। ছবি : এনার্জি বাংলা

বিশেষ সম্পাদকীয়

আত্মপ্রকাশ করল পাক্ষিক 'এনার্জি বাংলা'। বাংলা ভাষায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশবিষয়ক প্রথম পাক্ষিক। অজস্র পত্রিকার ভিড়ে আরও একটি পত্রিকা। তবে সেটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হবে, সেই লক্ষ্যে এই যাত্রা। এই লগ্নে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

'এনার্জি বাংলা' হবে একটি বিশেষায়িত পত্রিকা। ছাপা হবে শুধু বিদ্যুৎ জ্বালানি আর পরিবেশের খবর। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি থাকবে নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন। থাকবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্কের বিষয়াদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের রূঢ় বাস্তবতা আর উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি বিক্রির অসম প্রতিযোগিতার এই যুগে এনার্জি বাংলা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবে না। ভিন্ন মত প্রকাশিত হবে। যুক্তিগ্রাহ্য বিতর্ক হবে। বিভ্রান্তিকর খবরকে আমরা সব সময় 'না' বলব।

নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত পাওয়া সহজ নয়। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আরও কঠিন। সাধারণত ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিই আলোচনা ও বিশ্লেষণে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ফলে পাঠক বিভ্রান্ত হন। বঞ্চিত হন কোনো বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র থেকে। পাঠকের এই বিভ্রান্তি ও বঞ্চনা ঘোচানোর চেষ্টা করা হবে।

কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন। তবে কঠিনকে ভালোবেসেই পথ চলবে এনার্জি বাংলা।

আলোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নির্ভরশীল তথ্য প্রকাশ করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় মাসে, দেশের এক অনন্য অগ্রযাত্রার মধ্যে এনার্জি বাংলা আত্মপ্রকাশ করল। সামনে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। সময়টা দেশের সবার জন্য আনন্দের, উৎসবের, একসঙ্গে চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।

এনার্জি বাংলা প্রকাশের এই উদ্যোগে যারা সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন, তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। ভবিষ্যতেও তাঁরা এনার্জি বাংলার সঙ্গে থাকবেন বলে ভরসা রাখি।

বিদ্যুতের দাম : গণশুনানি

আমদানিনির্ভর এবং ব্যয়বহুল জ্বালানির কারণে উৎপাদন খরচ বাড়ছে, তাই দাম বাড়াতে হবে। আর ভোক্তাসহ অন্যরা বলছেন, অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বাড়ছে। সব দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হলে এ খরচ কমে যাবে।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিদ্যুতের দাম নিয়ে গণশুনানিতে বিইআরসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্যরা। ছবি: এনার্জি বাংলা

ইবি প্রতিবেদক

(বুধবার, ৪ ডিসেম্বর) বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবের শুনানি হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে (বিইআরসি) দেয়া পাইকারি ও ভোক্তা পর্যায়ের সব ক্ষেত্রের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিল সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো। আর সেই প্রস্তাবের ওপরে শুনানি হয়েছে। তবে শুনানিতে কোনো লাভ নেই বলে অভিযোগ করেছেন ভোক্তারা। তারা বলেন, বিইআরসি সবার কথা শুনে ঠিকই; কিন্তু রায় দেয়ার সময় তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। এক পেশে, শুধু বিদ্যুতের দামই বাড়ানো হয়। অর্থাৎ যে কোম্পানিগুলো দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে তাদের আবেদনই টিকে থাকে।

রাজধানীর কারওয়ানবাজারে টিসিবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত শুনানিতে এবার ভোক্তারা পুরো বাজার পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তারা বলেছেন, দেশে এখন সব পণ্যের দাম বেশি। প্রতিটি নিত্যপণ্য বাজারদরের চেয়ে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। এতে নির্ধারিত আয়ের মানুষের জীবিকা নির্বাহে সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুতের দাম বাড়লে জীবন দুর্বিষহ হবে। তাই দাম না বাড়ানোর দাবি করেন তারা।

আমদানিনির্ভর এবং ব্যয়বহুল জ্বালানির কারণে উৎপাদন খরচ বাড়ছে, তাই দাম বাড়াতে হবে। কোম্পানীগুলোর পক্ষে এই যুক্তি দেয়া হচ্ছে দাম বাড়ানোর পক্ষে। বলা হচ্ছে, বৈদেশি মুদ্রার বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, গ্যাসের মূল্য ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি, কয়লার ওপর নতুন করে ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি ও কোনো কোনো বিতরণ সংস্থা সময়মতো টাকা পরিশোধ না করায় দাম বাড়ানো প্রয়োজন। আগামী বছর প্রায় সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা লোকসান হতে পারে বলে জানিয়েছে পিডিবি।

আর ভোক্তাসহ অন্যরা বলছেন, অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বাড়ছে। সব দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হলে এ খরচ কমে যাবে।

পাইকারি বাড়লেই শুধু দাম বাড়াতে চায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আইবি)। এই বিতরণ সংস্থা লাভও করছে না, লোকসানও করছে না। তাই তাদের দামও বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে যদি পাইকারি বাড়ে সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে।

বিইআরসির চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম বলেন, পুরো প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করছি। বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে যথাযথ দাম নির্ধারণ করা হবে।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল আলম বলেন, বিদ্যুৎ খাতে পরিচালন ব্যয় ও দুর্নীতি কমানোর অনেক পথ আছে। সেগুলো বাস্তবায়ন করলে মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না। কৃত্রিমভাবে উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে খুচরা দাম বাড়নোর চেষ্টা চলছে। এটি অন্যায় ও অন্যায্য।

বায়ুদূষণকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংকট হিসেবে দেখতে হবে: পরিবেশমন্ত্রী

রাজধানী ঢাকায় বায়ুদূষণ অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। তিন কারণে বায়ুদূষণ বাড়ছে- ইটভাটা, মোটরযানের কালো ধোঁয়া এবং যথেচ্ছ নির্মাণকাজ। আট বছর ধরে এ তিন উৎস ক্রমেই বাড়ছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন একথা বলেছেন।

২৫ নভেম্বর পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকার বায়ু ও শব্দদূষণ নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনের আলোকে তিনি এতথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, শহরের বিভিন্ন স্থানে ভবন নির্মাণের সময় পানি ছিটানো, যন্ত্রপাতি যত্রতত্র ফেলে না রাখা ও নির্মাণসামগ্রী নির্ধারিত বেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হবে। বায়ুদূষণ মোকাবেলার প্রথম কাজ দূষণের উৎস বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত, শহরের বিভিন্ন স্থানে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা এবং জলাশয় রক্ষা করা। এ দূষিত বায়ু রোধ করে নগরের মানুষ কীভাবে নিরাপদ থাকবে, সে ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। সবার আগে বায়ুদূষণকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংকট হিসেবে দেখতে হবে।

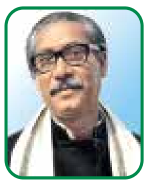

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী- 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষ্যে আমাদের লক্ষ্য:

১. ''মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ'' হিসেবে পালন;
২. জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া নিশ্চিত করা;
৩. গ্রাহক হয়রানি নিরসনে 'আলোর ফেরিওয়ালা' কর্মসূচী অব্যাহত রাখা;
৪. গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের 'উঠান বৈঠক' জোরদার করা;
৫. 'আমার গ্রাম – আমার শহর' বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা;
৬. ''দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স'' নীতি জোরদার করা;
৭. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে 'পেপারলেস অফিস' চালু করা;
৮. 'তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;
৯. কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা;
১০. পরিবেশ বান্ধব ২০০০ সোলার সেচ পাম্প স্থাপন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বিপপা'র নতুন কমিটি

নির্বাচিত হওয়ার পর বিপপা'র নতুন সভাপতি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ছবি: সংগৃহিত

ইবি প্রতিবেদক

(শুক্রবার, ২৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের (বিপপা) দুই বছরের পরিচালনা কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। বিপপার দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা শেষে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

নতুন সভাপতি হয়েছেন ইমরান করিম। তিনজন সহসভাপতি হয়েছেন। তারা হলেন- হুমায়ুন রশীদ, প্রকৌশলী মো. মোজাম্মেল হোসাইন ও নাভিদুল হক। সাত জন পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন– সালমান ওবায়দুল করিম, খালিদ ইসলাম, মাবরুর হোসাইন, ফরিদুল আলম, মঞ্জুর কাদির সাফি, আব্দুর রাজ্জাক রুহানি এবং এসএম নূর উদ্দিন। সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম।

নতুন প্রেসিডেন্ট ইমরান করিম এনার্জি বাংলাকে বলেন, দেশের শতভাগ মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌছে দিতে সরকারের সাথে আমরাও কাঁধ মিলিয়ে চলব। সাশ্রয়ী ও টেকসই বিদ্যুৎ দিতে বেসরকারিখাতের পক্ষ থেকে যা যা করার তা করা হবে।

বিপপা'র ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ লতিফ খান বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশের বেসরকারি উদ্যোক্তারা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বিপপা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাধারণ সভায় জানানো হয়, সব বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বিপপা'র সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক করা, বিপপা সদস্যদের আয় কর প্রত্যাহার এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে আমদানি করা যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট উপকরণ আমদানিতে আগাম কর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এগুলো এই সংগঠনের গত চার বছরের অর্জন।

বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশন (বিপপা) মোট ৫৩টি বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ২০১৪ সালের জুন মাসে গঠন করা হয়।

বিপপা'র নতুন কার্যকরী কমিটির পরিচালকদের ছবি

ইমরান করিম

হুমায়ুন রশীদ

মো. মোজাম্মেল হোসেন

নাভিদুল হক

সালমান ওবায়দুল করিম

খালিদ ইসলাম

মাবরুর হোসাইন

ফরিদুল আলম

মঞ্জুর কাদির সাফি

আব্দুর রাজ্জাক রুহানি

এসএম নূর উদ্দিন

আবদুল হালিম

প্রবহমান প্রবৃদ্ধির সংকটে জ্বালানি সাংবাদিকতা

শাহনাজ বেগম

জ্বালানি খাতের প্রবহমান প্রবৃদ্ধির সংকটে পড়েছে জ্বালানি সাংবাদিকতা। ভূ-রাজনীতি, পরিবেশ, কৃষি, নারী, পানিসম্পদ সর্বোপরি বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে জ্ঞান প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতার মিশেল দিতে গোটা জ্বালানি খাতে যে নবসংযুক্তি ঘটেছে তার সঙ্গে তাল মেলাতে, সাংবাদিকরা নতুন তথ্য জানতে খানিকটা খাবি খাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এবং বিনিয়োগকারীরা তাদের যে অনুবীক্ষণে সাংবাদিকতা পরখ করছেন তার সাথে সাংবাদিকদের অবস্থান মিলছে না। পরস্পরকে ছোট করে দেখার সুযোগ ঘটাচ্ছে উল্লিখিত নতুন অনুঘটক।

এই অবস্থা নিরসনে সরকার খানিকটা এগিয়ে এসে তার অধীনস্তদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণ ও দেশে-বিদেশে কর্মশালার আয়োজন করছে। অন্যদিকে এই খাতে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরা এসব সুযোগ না পেয়ে অপেশাদার ও সুযোগসন্ধানী সোর্সদের দ্বারা প্রভাবিত, কখনো কখনো নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ছেন যা আজকের জ্বালানি সাংবাদিকতার ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির চিত্র গত দশ বছর যা প্রত্যক্ষ করছি, তা বিনির্মাণে জ্বালানি খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো নির্মাণে ও অর্থনীতির ঘূর্ণায়মান চাকা সচল রাখতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি পূর্বশর্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য মেগাওয়াটের হিসাবে বাংলাদেশ অতিউজ্জ্বল মানমন্দির স্পর্শ করলেও নির্ভরযোগ্য জ্বালানি প্রবাহে নাজুক। এই চিত্র এমন যে, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড যখন তার পাঁচ হাজার মেগাওয়াট উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায়, তখন বিকেএমইএ'র সভাপতি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না পাওয়ায় প্রতিদিন ৩০০ কোটি টাকা লোকসানের হিসাব তুলে ধরেন সাংবাদিকদের কাছে।

অন্যদিকে জ্বালানি আমদানি-রপ্তানির বিষয়টি উত্থাপিত হলে এর সঙ্গে মিশে যায় ভূ-রাজনীতির বিষয়। বলা বাহুল্য, যা উত্থাপন করেন কিছু রাজনীতিক, আর কিছু বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞ তৎপরতায় নেমে পড়েন। সাংবাদিকদের ফোন বেজে উঠতে শুরু করে। কখনো কখনো সাংবাদিকরাও ছুটে যান। তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় বিভ্রান্তিকর ও অর্ধসত্য তথ্য সম্ভার। তখন তাঁরা মুদ্রার উভয় পিঠে চোখ বুলানোরও প্রয়োজন বোধ করেন না। ফলে জনমনে সৃষ্টি করেন বিভ্রান্তি।

এর সুযোগ নেন বিনিয়োগকারী, টেন্ডারবাজ আর এক শ্রেণির কর্মকর্তারা। তৈরি হয় 'হলুদ সাংবাদিক বাহিনী' যাদের দৌড়ঝাঁপ বেড়ে যায় সর্বত্র। অবচয়-অপচয়ের ফাঁকে পরিস্থিতি ধাবিত হয় অন্যদিকে। পক্ষ-বিপক্ষের তকমা জোটে সাংবাদিকদের ললাটে। বিশ্বায়নের যুগে তাল মিলিয়ে চলা ক্ষুরধার লেখনী উপস্থাপনা দূরে থাক- এই যুগে কোন 'বক্ররেখা' অথবা 'সমান্তরাল রেখায়' জ্বালানি খাত চলছে তা জানার সুযোগ ঘটে না কলমপেশিদের।

সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ভারতে এলপিজি রপ্তানি নিয়ে অদ্ভুতভাবে বিবিসির মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদ মাধ্যম ভুল খবর প্রকাশ করল। ফলাফল রাজনৈতিক উত্তাপ, অর্থহীন বিতর্ক ও বিভ্রান্তি। সরকারপ্রধানকে এ বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরা, আর চায়ের টেবিলে তুবরি ফোটানো। বিবিসি দুঃখ প্রকাশ করে সংবাদটি প্রত্যাহার করে নিল। এসব ঘটল কারণ, সংবাদ পরিবেশনে জ্ঞান প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতার অভাব আর কুবুদ্ধি এবং অপেশাদার বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার প্রভাব। তাই বলছি, আজকের জ্বালানি সাংবাদিকদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষ শানিত করতে হবে। নিজস্ব পড়াশোনার ফাঁকে, এ বিষয়ে চারপাশে কি হচ্ছে তা অবলোকন করে জনগণকে অবহিত করতে হবে। সাংবাদিকদের অনেক সংগঠন দাঁড়িয়ে গেলেও পেশাগত মান উন্নয়নে পিছিয়ে।

বিশ্বায়নের এই যুগে উন্নয়নের রোল মডেলের ট্রেনে উঠে পড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে নির্ভুল তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং তা উপস্থাপনের বিকল্প নেই।

সফল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় যেমন প্রথম সারিতে, তেমনি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার পূরণে সর্বোচ্চ স্থানে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনীর অংশ সাংবাদিকরাও। তাদের সত্যনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা সংশ্লিষ্টদের কর্তব্য বলে মনে করি। একই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চৌকস তথ্যসমৃদ্ধ শিক্ষিত সাংবাদিক সমাজ জ্বালানি খাতের প্রবৃদ্ধির প্রধান সহায়ক শক্তি। সরকার, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও বিনিয়োগকারী এই চার অনুঘটকের সঙ্গে সাংবাদিকদের কোনো বিরোধ নেই। তবে 'কনফিক্ট অব ইন্টারেস্ট এরিয়া' রয়েছে। এই সুক্ষ্ম বিভাজন রেখা মাথায় রেখে জবাবদিহিমূলক অবস্থান তৈরি করতে হবে। তাতেই জনগণ হলুদ নয়, তথ্যবহুল যথাযথ সাংবাদিকতার দিক নির্দেশনা পেতে পারেন।

লেখক : সাংবাদিক

মধ্যপ্রাচ্যে সংকট : ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্ব অর্থব্যবস্থা

রানা নজরুল

জ্বালানি তেল বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তি! বিশ্বের শক্তির উৎসের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি দখল করে রেখেছে এই তেল। তেলের দাম বৃদ্ধি মানেই জীবনের প্রতিটি আর্থিক অনুষঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধি। তাই হঠাৎ করে তেলের দাম বেড়ে গেলে জোর ধাক্কা খাবে বিশ্ব অর্থনীতি। পারস্য উপসাগর তীরের অনেক দেশ জ্বালানি তেলে ভরপুর। এসব দেশে বিশ্বের ৬৫ শতাংশ তেলের মজুদ।

এ কারণে মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বা জনপদ। ১৯৭৩ সালে, যখন আরব রাষ্ট্রগুলো কিছু ধনী দেশের কাছে তেল বিক্রিতে অসম্মতি জানিয়েছিল, তখন মাত্র ছয় মাসে ব্যারেল প্রতি দাম ৩ ডলার থেকে বেড়ে ১২ ডলারে উঠেছিল। তাতে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়। ১৯৭৮, ১৯৯০ এবং ২০০১ সালে তেলের দাম বাড়ার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছিল। অনেক অর্থনীতিবিদ বিশ্বাস করেন যে, ২০০৮ সালের বৈশ্বিকমন্দার পেছনেও আসলে তেলের দাম বৃদ্ধিই কাজ করেছিল। স্থিতিশীল বিশ্ব অর্থনীতির জন্য মধ্যপ্রাচ্যের তেলের অবাধ ও নির্বিঘ্ন সরবরাহ এখন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কিছুদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। সৌদি আরব বিশ্বের ১০ শতাংশ তেল উত্তোলন ও সরবরাহ করে। সম্প্রতি সৌদি আরবের তেল উৎপাদন দৈনিক ৫৭০ লাখ ব্যারেল কমেছে, যা দেশটির দৈনিক তেল উৎপাদনের অর্ধেকের সমান। কিছু দিন আগে তেলের দাম একদিনেই ২০ শতাংশ বেড়ে যায়, যা গত ৩০ বছরের মধ্যে একদিনে সর্বোচ্চ।

এ সময় সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান সতর্ক করে বলেন, ইরানকে নিবৃত্ত করতে বিশ্ববাসী যদি কিছু না করে, তাহলে জ্বালানি তেলের দাম কল্পনাতীত রকমের বেড়ে যেতে পারে। ইরান আর সৌদি আরবের মধ্যে যদি যুদ্ধ লেগে যায় তাহলে বিশ্ব অর্থনীতিকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল যায় এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং অন্যান্য জায়গায়। হরমুজ প্রণালির একদিকে আছে আরব দেশগুলো। অন্যপাশে ইরান। হরমুজ প্রণালির সবচেয়ে সংকীর্ণ যে অংশ সেখানে ইরান এবং ওমানের দূরত্ব মাত্র ২১ মাইল। পৃথিবীতে যে পরিমাণ জ্বালানি তেল রপ্তানি হয়, তার পাঁচভাগের একভাগ অর্থাৎ প্রতিদিন এক কোটি ৯০ লাখ ব্যারেল তেল রপ্তানি হয় হরমুজ প্রণালি দিয়ে।

১৯৮০'র দশকে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় ইরাক এবং ইরান পরস্পরের তেল রপ্তানি বন্ধ করতে চেয়েছিল। এখন ইরান যদি হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয় তাহলে পৃথিবীজুড়ে জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ এই পথ বন্ধ হলে বিশ্ব তেলের বাজারে অস্থিরতা দেখা দেবে। মূলত ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনার কারণে হরমুজ প্রণালিতে একের পর এক তেল ট্যাংকারে হামলা হয়েছে! হামলা হয়েছে সৌদি তেল কোম্পানির স্থাপনায়ও।

বিশ্লেষকরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অস্থিরতা, সংঘাত মানে নিশ্চিতভাবে বিশ্বের অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা। বিশ্ব অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তেলের দাম বাড়লে বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সূত্র : বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান

লেখক : সাংবাদিক

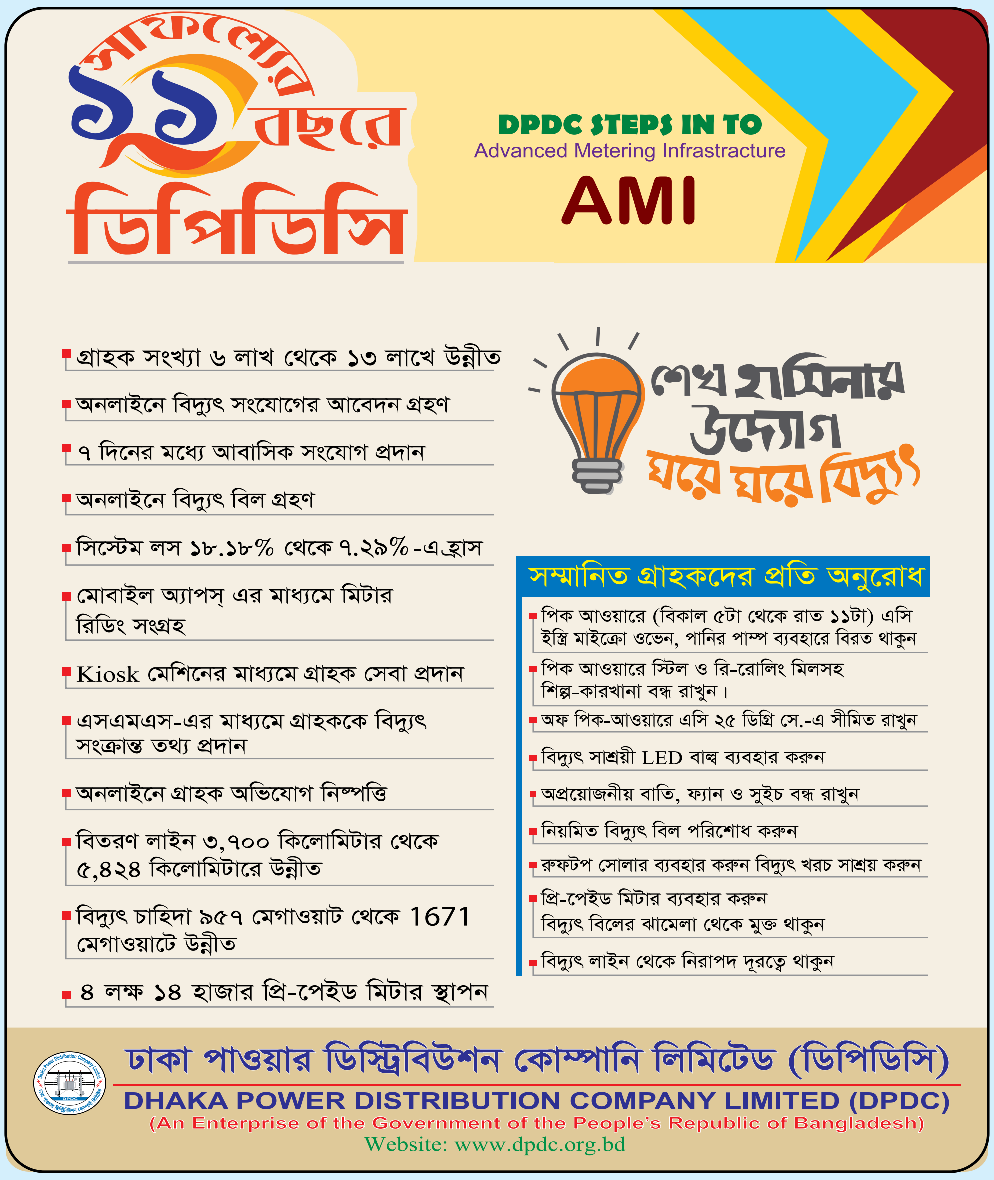

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীরবিক্রম। প্রতিকৃতি : এম এ কুদ্দুস

বিদ্যুৎ ব্যবহার ও দামে সমতা আনা হবে

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীরবিক্রম

বিদ্যুৎ ব্যবহারে দায়বদ্ধতা আনতে হবে। প্রথাগত অর্থনীতি যদি আলোচনা করা যায় তবে বলা হবে যে, সরবরাহ ও চাহিদার সাথে অর্থ থাকলেই বিদ্যুৎ দেয়া যাবে। কিন্তু 'না'। আমরা সেটা বলছি না। পয়সা থাকার পরও ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারবে না। পয়সা থাকার পরও কেউ অপচয় করতে পারবে না। এটা সামাজিক আন্দোলন।

বিদ্যুৎ পরিস্থিতির সাথে উন্নতি হয়েছে অর্থনীতির। দেশে বিদ্যুৎ আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমান্তরালভাবে হয়েছে। বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আট শতাংশ ছাড়িয়েছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্র্য অর্ধেক কমেছে। মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ ছিল, এখন ২০ শতাংশ হয়েছে। এ ছাড়া শিশু মৃত্যুহার, মাতৃ মৃত্যুহার কমেছে। বাচ্চারা লেখাপড়া করছে। গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে। এসব হওয়ার পরও সব মিলিয়ে হইতো যতদূর যাওয়ার দরকার ছিল ততদূর হয়নি। সেটা ভবিষ্যতের জন্য চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একটু পেছনে ফিরতে চাই। বিদ্যুৎ-জ্বালানি নিয়ে ২০০৯ সাল থেকে আলোচনা করতে চাই। আর যদি শুধু বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা করি, তবে সবার কাছে সহজ হবে, প্রণিধানযোগ্য হবে। আগে ৪৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ পেত। আর গ্রামে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকত না। উৎপাদন ছিল সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট। উৎপাদন ক্ষমতা ছিল সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াট। এখন যদি ২০১৯ সালে আসি, দশ বছর পরে। তবে দেখা যাবে, যেটা ছিল ৪৫ শতাংশ সেটা এখন হয়েছে ৯৫ শতাংশ। আর ১২/১৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকাটা হয়েছে এক-আধ ঘণ্টা। উৎপাদন মতা এখন ২২ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। এখান থেকে বোঝা যায় কতটা উন্নতি হয়েছে।

বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানোর পর এখন ব্যবহারে এবং দামে সমতা আনা হবে। যারা গ্রিড ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাদের খরচ একটু বেশি। এখানে অসক্ষমতা থাকার যুক্তি নেই। দাম আলাদা কেন হবে? এটা সমন্বয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটাতে লাভ হবে। কারণ গ্রিড করতে বিনিয়োগ করা লাগবে না। যেখানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে গ্রিড না করে যদি নবায়নযোগ্য জ্বালানি দেয়া যায় তাহলে গ্রিড করার বিনিয়োগটা আর লাগছে না।

চরে বা যেখানে গ্রিড যায়নি সেখানে নবায়নযোগ্য দিয়ে মিনিগ্রিড করা হবে। এক জায়গাতে চার্জ ব্যবস্থা থাকবে। সবাই সেখান থেকে নিয়ে যাবে। এতে গ্রাহকের বিদ্যুতের মূল্য সুলভ হবে। এখানে ঐ গ্রাহকদের সাথে গ্রিডের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করা হবে। এজন্য বাড়তি যে অর্থ লাগবে, তা সংশ্লিষ্ট সরবরাহ কোম্পানির হিসাবের মধ্যে চলে যাবে। ঘাটতিটা সমন্বয় করে বিদ্যুতের দাম একই রাখা হবে। যে এলাকায় গ্রিড যায়নি সেখানে এমন সেবা দিতে সর্বোচ্চ একশত কোটি টাকা সমর্থন লাগবে। অফ গ্রিড এলাকায় ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ থাকবে না। এ বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছি। এ ছাড়া সর্বোচ্চ চাহিদার সময় আর অন্য সময়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। এগুলো আমাদের গুছিয়ে আনতে হবে। যে এলাকায় এখন সৌর আছে কিন্তু গ্রিড যাচ্ছে সেখানে সৌর ব্যবহারকারীদের কী হবে? তাদের একটা উপায় ঠিক করার কথা ভাবা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ব্যবহারে দায়বদ্ধতা আনতে হবে। প্রথাগত অর্থনীতি যদি আলোচনা করা যায় তবে বলা হবে যে, সরবরাহ ও চাহিদার সাথে অর্থ থাকলেই বিদ্যুৎ দেয়া যাবে। কিন্তু 'না'। আমরা সেটা বলছি না। পয়সা থাকার পরও ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারবে না। পয়সা থাকার পরও কেউ অপচয় করতে পারবে না। এটা সামাজিক আন্দোলন। জ্বালানি ব্যবহারে পরিবর্তন আনলে পৃথিবীতে অনেক সম্পদ কম লাগতো। যদি খাওয়া অপচয় না করি, পানি অপচয় না করি, অনেক জ্বালানি সাশ্রয় হবে। যদি পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে নিজের উদ্যোগে মাসে একজন একদিন গাড়ি না চালায় তবে বহু জ্বালানি সাশ্রয় হবে। ক্রয়ক্ষমতা থাকলেও, কম ব্যবহার করতে হবে। দায়বদ্ধতার কারণেই আমাদের এখানে বিদ্যুতের দামটা বাজারদরে দেয়া হয় না। দাম নির্ধারণে লাইফলাইন রাখা হয়েছে। এটাকে 'ম্যারিড গুড' বা প্রয়োজনীয় পণ্য বলে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে এটা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে। শিল্পসহ ব্যক্তি পর্যায়েও সাশ্রয়ী হতে হবে। এটা আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে নিচ্ছি। উনি সবসময় বলেন, 'ঘর থেকে গেলে সুইচ অফ করবেন, ফোনটা বন্ধ করবেন।' শিল্পে দক্ষ যন্ত্র ব্যবহার এবং যাদের ক্যাপটিভ আছে তাদের দ্বৈত উৎপাদন করতে বলা হয়েছে। সব শিল্প কারখানায় বয়লার আছে।

যাদের নিজস্ব বাড়ি নেই তাদেরও অধিকার আছে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার। কিন্তু আইন অনুযায়ী দেয়া যায় না। তাহলে গরিব মানুষ কীভাবে বিদ্যুৎ পাবে। এই সমস্যা সমাধানে আইনে সংশোধন করা হয়েছে। এখন যাকে ইচ্ছে বিদ্যুৎ দেয়া যাবে।

বাংলাদেশে প্রথমে যখন সংকট ছিল তখন দ্রুত সমাধান করার জন্য ফার্নেস ওয়েল ও তেল দিয়ে বিদ্যুৎ করা হয়েছে। এখন কয়লা আসছে, এলএনজি আসছে। আমদানি ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে। বাড়তি উৎপাদন হলে রপ্তানিও করতে হতে পারে। সেটা পরিস্থিতি অনুযায়ী হবে। তেল দিয়ে যে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো করা হয়েছিল তা এখন আর আগের মতো করে নেই। নতুন করে যে চুক্তি হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, শুধু প্রয়োজনের সময় বিদ্যুৎ নেয়া হবে। আর যখন নেয়া হবে শুধু তখনই দাম দেয়া হবে। এতে ক্যাপটিভ ও সান্ধ্যকালীন উৎপাদন খরচ কমবে।

নিজেদের স্থলভাগ ও সমুদ্রে আরও অনুসন্ধান চলছে। আগে ধারণা ছিল ডিম্বাকৃতি কাঠামো ছাড়া গ্যাস থাকে না। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে উপরে-নিচে সোজা পাথরের কাঠামোতেও গ্যাস থাকতে পারে। পাবনাসহ উত্তরের কিছু এলাকায় এমন কাঠামো থাকার সম্ভাবনা আছে। সমুদ্রে বিনিয়োগের বিষয়টা বিশ্বের তেলের দামের ওপর নির্ভর করে। আমাদের যখন সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হয়েছিল তখন তেলের দাম কম ছিল। তাই তখন সমুদ্রে সন্তোষজনক বিনিয়োগ আসেনি। এখন বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে। সাথে বিনিয়োগকারীদের প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে। এখন অনেকে বিনিয়োগ করবে আশা করছি। অনেকে বলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ বান্ধব না। তাই যদি হবে তবে এত এত উন্নতি হচ্ছে কী করে। এখানে সব মানুষকে নিয়ে যে উন্নতি হচ্ছে তা বিরল। বিনিয়োগের সবচেয়ে ভালো পরিবেশ। যাই হোক সমুদ্রে গ্যাস পেলও তা ব্যবহার করতে কমপক্ষে ১০ বছর লাগবে। এই সময়ের জন্য জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে। আমদানি করা এলএনজি ও কয়লা সেই জরুরি প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

কিছুদিন পর কোনো সংকটই থাকবে না। গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছাতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) খুব ভালো কাজ করছে। স্রেডা, ইডকল অনেক এগিয়েছে। এনার্জি রিসার্চ কাউন্সিল উপযোগী গবেষণা করছে।

সনাতনী যে ব্যবস্থা তা থেকে বের হতে হবে। নিজেদের উদ্ভাবন বাড়াতে হবে। নিজস্ব উদ্ভাবনী ছাড়া বিকল্প নেই। বিদেশের প্রযুক্তি নির্ভরতা কমাতে হবে। বিদেশি শুধু না নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি ব্যয় করে কাজে লাগানো হবে। নতুন নতুন খুঁজতে হবে, কীভাবে তা করা যায়। আমরা সমাজের বিবর্তন চাই। পরিবর্তন চাই। সমাজের সবাইকে নিয়ে একসাথে এগিয়ে যেতে চাই।

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

(অনুলিখন : ইবি প্রতিবেদক)

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

আপনার বিদ্যুৎ বিল কীভাবে কমাবেন?

আপনার বিদ্যুৎ বিল কমাতে হলে-

- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন লাইট, ফ্যান কম্পিউটার, টেলিভিশন, ওভেন ইত্যাদি ব্যবহার শেষে স্ট্যান্ডবাই মোডে না রেখে সুইচ বন্ধ করুন;
- এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে রাখুন;
- এলইডি বাল্বসহ বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ফ্যান, টেলিভিশন, ফ্রিজ, পানির পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন;
- অপ্রয়োজনে আলোকসজ্জা ও বিদ্যুৎ অপচয় পরিহার করুন;
- বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ভবন নির্মাণ করুন, প্রাকৃতিক আলো-বাতাস ব্যবহার করুন;
- আপনার সন্তানকে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দিন;
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে অপচয় রোধ করুন এবং অন্যকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুযোগ দিন;
- বিদ্যুৎ দেশের প্রাণশক্তি। উৎপাদনশীল খাতে একে ব্যবহার করুন এবং দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করুন;
- বিদ্যুৎ খরচ কম হলে আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বিউবো (জন) ১২০৩- ডিস্‌প্লে/২০১৯, তারিখ ০৪/১১/২০১৯

নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী জ্বালানি নিশ্চিত করাই এখন চ্যালেঞ্জ

নসরুল হামিদ । প্রতিকৃতি : এম এ কুদ্দুস

নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী জ্বালানি নিশ্চিত করাই এখন সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ । দ্রুত প্রযুক্তি পরিবর্তনে বিনিয়োগ পরিকল্পনায় সতর্ক থাকতে হচ্ছে বলেও তিনি জানান । তিনি বলেন, সরকার সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে জ্বালানির দাম রাখতে চায় । সে কারণেই ভর্তুকি । এনার্জি বাংলা'র প্রতিনিধিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন । নিচে সাক্ষাৎকারের বিবরণ তুলে ধরা হলো

বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে এখনকার চ্যালেঞ্জ কি বলে মনে করেন?

এখন দুটো চ্যালেঞ্জ । নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ জ্বালানি দেয়া । সেই জায়গাতে পৌঁছাতে হলে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে । বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কিছু নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে ।

সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কি আমরা ঠিক পথে আছি?

হ্যাঁ ঠিক পথেই আছি । বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে কিছু অবকাঠামো দরকার । সেগুলো করার চেষ্টা করছি । যদি কয়লা, এলএনজি ও এলপিজির আলাদা আলাদা টার্মিনাল থাকত তাহলে এসব জ্বালানি আমদানি সহজ হতো । এখন আমাদের এসব অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে । ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে । বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে চেনে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ হিসেবে । তিনি আধুনিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন । তাঁর নির্দেশনায় দেশের গ্যাস ও বিদ্যুতের সমস্যা দূর হচ্ছে । এখন বিদ্যুতের জন্য কেউ রাস্তায় নামে না । মিছিল করে না । বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় । বাসাবাড়িতে সৌর স্থাপনে বিশ্বে প্রথম । মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম । সবজি উৎপাদনে চতুর্থ । যথাযথ নেতৃত্বের জন্যই অল্প ভূমিতে বিপুল জনগোষ্ঠী নিয়েও এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে । এটাই প্রমাণ করে যে আমরা ঠিক পথেই আছি ।

জ্বালানির দাম তো বাড়ছেই । নিকট ভবিষ্যতে দাম কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ।

জ্বালানির দাম অবশ্যই কমবে । যখন এইসব অবকাঠামো হয়ে যাবে । প্রাথমিক বিনিয়োগ হয়ে যাবে । তখন আর দাম বাড়ানো লাগবে না । বিশ্বপ্রেক্ষাপট এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে এক লক্ষ্যে থেকে আগানো যাচ্ছে না । আজ যে প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে দু'বছর পরেও তা থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই । আমাদের প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে । এখন যে তেল দিয়ে যানবাহন চলছে । আগামী পাঁচ বছর পরে তা হয়তো চলবে না । সব চলবে বিদ্যুতে । যানবাহন যদি বিদ্যুতে চলে তখন তেল আমদানি কমে যাবে । প্রযুক্তি পরিবর্তনের সাথে ব্যবহারেরও পরিবর্তন হচ্ছে । এ জন্য এখন যে বিনিয়োগ তা যদি পাঁচ বছর পরে কাজে না লাগে তবে তা অপব্যয় হবে । সেটা তো আর করা যাবে না । প্রযুক্তি পরিবর্তনের সাথে যেমন তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে তেমনই নিজস্ব উৎপাদনের যোগানও বজায় রাখতে হচ্ছে । এটা আমাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ।

ভর্তুকি থেকে আমরা বের হতেই পারছি না । সাথে আবার দামও বাড়ছে । এতদিন তেল ও বিদ্যুতে ভর্তুকি ছিল । মাঝখানে তেল বাদ গেল । এখন আবার গ্যাসে । গড়ে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটা ভর্তুকি থাকছেই ।

হ্যাঁ । এটাই তো ঐ যে বললাম, সরকার সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে জ্বালানির দাম রাখতে চায় । সে কারণেই এই ভর্তুকি । এটা শুধু ভর্তুকি নয় বিনিয়োগও বটে । ভর্তুকির মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে । একই সাথে বড় স্থাপনাতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে । এই বিনিয়োগের অর্থও যদি ভোক্তাদের কাছ থেকে নেয়া হতো তবে অনেক বেশি খরচ হতো । জ্বালানিতে খরচ কম করে যে মানুষ শিক্ষায় খরচ করতে পারে, জীবনযাপন যেন সহজ হয় সেজন্যই এই ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে । নয় টাকার বিদ্যুৎ চার টাকায় দিচ্ছি । জ্বালানি খাতে দ্রুত আগানোর উপায় বের করা হচ্ছে । যদি আরও ৫০ কোটি ঘনফুট গ্যাস দেশের মধ্য থেকে সরবরাহ করা যায় তবে খরচ কিছুটা কমবে ।

বলছেন যে গ্যাসের আর কোনো সংকট নেই । আসলেই কী তাই? সংকট শেষ?

গ্যাস তো এখন আমরা আমদানি করছি । সেই সংকট নেই । সিএনজিতে আর ভর্তুকি দিচ্ছি না । এটা করা হয়েছিল পরিবেশের কথা মাথায় রেখে । বিদ্যুৎ জ্বালানি খাত এখন অনেক বড় । এলএনজি ও বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে । তাই সংকট আর নেই । আমাদের নিজস্ব গ্যাস দিয়ে গত এক দশক জিডিপি সাত ভাগের ওপরে রাখা হয়েছে ।

এই উন্নয়নে যে অর্থ প্রয়োজন তা কীভাবে মেটাবেন?

নানাভাবে এই খাতে বিনিয়োগ করছি । বাংলাদেশের বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের সবচেয়ে ভালো সময় এখন । বিদেশিদের জন্য বিনিয়োগের উত্তম পরিবেশ । স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি, স্থলভাগে এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, স্থল ও সাগরে গ্যাস-তেল অনুসন্ধান, এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুকেন্দ্র, গ্যাস সঞ্চালন ও ব্যবস্থাপনায় এখনই বিনিয়োগ করার সময় । বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশিদের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং কর সুবিধা দেয়া হচ্ছে ।

তাহলে সামগ্রীক অবস্থা কী দাঁড়াল ।

গত পাঁচ বছরে প্রায় দুই কোটি নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে । এখন আর গ্যাস সংকট নেই । বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চার গুণ বেড়েছে । এখন ৯৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে । এই সাফল্য ধরে রাখাও আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ মনে করি । আর সেই চ্যালেঞ্জেও আমরা উতরে যাব আশা করি ।

ধন্যবাদ আপনাকে ।

আপনাকেও ধন্যবাদ ।

বাংলাদেশে জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহারের কৌশল

ম তামিম

ম তামিম

বিশ্বে বিদ্যুতের বাজার পরিবর্তন হচ্ছে। টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অনেক দেশ নীতিগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে যাচ্ছে। ইউরোপ এই প্রবণতার নেতৃত্ব দিচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এনার্জি আর্কিটেকচার পারফরম্যান্স সূচক (ইএপিআই) ২০১৭-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুইজারল্যান্ড বিশ্বের এক নম্বর অর্থাৎ সব থেকে ভালো জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশ। জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বেশিরভাগ দেশ এই তালিকার শীর্ষ স্থানে। দক্ষিণ আমেরিকার তিনটি দেশ - কলম্বিয়া, উরুগুয়ে এবং কোস্টারিকা শীর্ষ বিশ্বে অবাক করে জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জ্বালানি ব্যবহারকারী - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, ভারত এবং চীন জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশগুলোর চেয়ে পিছিয়ে আছে।

ইএপিআই একটি দেশের জ্বালানি ব্যবহার, সংগ্রহ এবং বিতরণের বিভিন্ন দিকের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। জ্বালানি আর্কিটেকচারের প্রধান উপাদানগুলো হল সাশ্রয় যোগ্যতা, শক্তি মিশ্রণে কম কার্বণ জ্বালানির অনুপাত গুণমান, সরবরাহের বৈচিত্র্য, স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক বিকাশ।

বাংলাদেশ ১২৭টি দেশের মধ্যে ১০৪ নম্বর অবস্থানে আছে। ২০১৫ সালের পরে ১১২ নম্বর অবস্থান থেকে ১০৪ নম্বরে এসেছে। কিছুটা উন্নতি হলেও বৈশ্বিক জ্বালানি ব্যবহারের গড় সূচক ০ দশমিক ৬২ এর চেয়ে অনেক নিচে। বাংলাদেশের স্কোর ০ দশমিক ৫১। আপাত দৃষ্টিতে, এই পার্থক্য বড় দেখায় না, তবে ব্যবধান কমাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই বিশাল বিনিয়োগ এবং দায়বদ্ধতার প্রয়োজন। শীর্ষস্থানে থাকা সুইজারল্যান্ড ০ দশমিক ৮০ স্কোর করেছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নে ০ দশমিক ৬৩ স্কোর করে বিশ্বের ২৩তম স্থানে রয়েছে। তবে পরিবেশগত স্থায়ীত্বের (স্কোর ০.৪৩, অবস্থান ১১১ তম) এবং জ্বালানি ব্যবহারে ও সুরক্ষার (স্কোর ০.৪৬, অবস্থান ১০৯ তম) বিষয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। দেশে প্রাইভেটকার ও গণপরিবহনের জ্বালানি অর্থনীতিতে উন্নতি করার বিশাল সুযোগ আছে। বৈদ্যুতিক এবং হাইব্রিড গাড়ি ব্যবহার পরিবহন খাতে সিও-২ নির্গমণকে নীচে নামিয়ে দেবে। সিও-২ নির্গমন কমানো এবং প্রচুর পরিমাণে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ আছে।

জ্বালানি ব্যবহার ও সুরক্ষায় বর্তমানে ৯০ ভাগের বেশি মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সত্ত্বেও মানসম্পন্ন বিদ্যুতায়নে পিছিয়ে। বর্তমানে মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নয়। ভোল্টেজের ওঠানামা এবং সরবরাহ বাধাগুলো সাফল্যকে পিছিয়ে দিয়েছে। বাসায় রান্নার জন্য এলপিজি চাপানোর সরকারি উদ্যোগ প্রশংসনীয়, তবে জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ রান্নার জন্য বেশি দামের জ্বালানি এলপিজি ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক নিচে অবস্থান করছে। গ্যাসের একক জ্বালানি নির্ভরতা ব্যয়বহুল তেলের ব্যবহারে পরিবর্তিত হয়েছে। এলএনজি যুক্ত করে জ্বালানি আমদানিও বৈচিত্র্যযুক্ত হয়েছে।

জ্বালানি একমাত্র খাত যা, বাংলাদেশে সময়োপযোগী সরবরাহ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের পক্ষে সহায়তা করেছে। গত ৯ বছরে বিদ্যুতের উচ্চমূল্যের জন্য সরকারের সমালোচনা হলেও বিদ্যুৎ না থাকার হতাশা থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে। এটি নাগরিকদের মধ্যে সুরক্ষা বোধ তৈরি করেছে। সীমিত জ্বালানি সরবরাহ সত্ত্বেও রপ্তানি বেড়েছে। দক্ষতার উন্নতি এবং যথার্থ দামের মাধ্যমে এটা আরও ভালো করা যেত। দুর্ভাগ্যক্রমে, গত কয়েক বছরে ৬-৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি থাকলেও কর্মসংস্থানে তেমন কোন অর্থবহ প্রতিফলন ঘটেনি। তবে অবকাঠামোতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

বিদ্যুৎ জ্বালানি ব্যবহার সব মানুষের অধিকার

আমদানি করা জ্বালানির ওপর নির্ভরতা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় হুমকি। ২০৩০ সালের মধ্যে ৯০ ভাগ জ্বালানি আমদানিনির্ভর হবে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে সমস্ত জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা (এলএনজি, এলপিজি, তরল জ্বালানি, কয়লা) আমদানি করে মেটাতে হবে। আমদানি করতে প্রতি বছর কমপক্ষে ২ হাজার কোটি ডলার প্রয়োজন হবে। বর্তমানে বছরে প্রায় তিনশ' কোটি ডলারের তরল জ্বালানি আমদানি করা হয়। এ ছাড়া এক বিসিএফডি (দৈনিক ১০০ কোটি ঘনফুট) এলএনজি আমদানিতে প্রতি বছর খরচ হবে ৩৬০ কোটি ডলার। পেট্রোবাংলা ২০২৪ সালের মধ্যে ৪ বিসিএফডি আমদানি করার কথা ভাবছে।

বাংলাদেশের পক্ষে উত্তম বিকল্প হলো স্থলভাগে এবং গভীর সাগরে আরও বেশি গ্যাস অনুসন্ধান করা। একই সঙ্গে স্থানীয় কয়লা ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে। যদিও জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে সমস্ত দেশকে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো কমানো বা বর্জন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কোনকিছু টেকসই করতে হলে এমনভাবে করতে হয় যেন, ভবিষ্যতে এর প্রাপ্যতা কমে না যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি এক সময় শেষ হয়ে যাবে। এটা টেকসই হয় না। এজন্য নবায়নযোগ্য এবং পারমাণবিক জ্বালানি পছন্দের প্রবণতা বেশি। ইউরোপীয় এবং অন্যান্য দেশ তাদের জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করছে এবং ব্যাপকভাবে বিকাশ হয়েছে। তবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অঞ্চল নির্ভর। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাংলাদেশের কাছে বায়ু বা পানির যথেষ্ট উৎস নেই। একমাত্র সম্পদ হলো সৌর শক্তি। স্রেডার সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বর্তমান প্রযুক্তিতে বাংলাদেশে প্রায় ৮ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা আছে।

দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্বালানি সংরক্ষণ এবং সর্বোত্তম জ্বালানি মিশ্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সঠিকভাবেই এই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

শুধু উৎপাদন বাড়ানোই বিদ্যুৎখাতের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। এটি হওয়া উচিত দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতামূলক, অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরযোগ্য, আরও দক্ষ, সর্বনিম্ন উৎপাদন খরচে।

আগামী ১৫-২০ বছরের জন্য প্রাথমিক জ্বালানি চাহিদা মেটাতে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত।

টেকসই জ্বালানি সরবরাহে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দেয়া, আঞ্চলিক জ্বালানি বাণিজ্য বাড়ানো, বিদ্যুতের দক্ষতা বাড়ানো, সঞ্চালন ও সরবরাহ লোকসান কমানো, পুরানো বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামত করে দক্ষতা বাড়ানো, যাতে গ্যাস কম ব্যবহার হয়। শিল্পে সমন্বয়, চাহিদা ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা খরচ ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, যা এখন ২২ শতাংশ আছে। বর্তমানে বছরে এক টিসিএফ গ্যাসের ব্যবহার ২০৩০ সালের মধ্যে দুই টিসিএফ হবে। অনুসন্ধান ও এলএনজি আমদানি এই ঘাটতি পূরণ করবে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত তরল জ্বালানি আমদানি বাড়বে। ২০২০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট সৌর শক্তি (৩৪০ বাণিজ্যিক, ১৬০ সামাজিক) উৎপাদিত হতে পারে। এনএলডিসিকে স্বাধীন করতে হবে। জাতীয় কয়লা নীতি চূড়ান্ত করতে হবে।

বাংলাদেশে পরিকল্পনা সমন্বিত হয় না, ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে তিনটি বিদ্যুৎ সিস্টেমের মাস্টার প্ল্যান প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি। স্থানীয় গ্যাস সম্পদের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব, স্থানীয় কয়লা ব্যবহারের নীতি পরিবর্তন এবং অবশেষে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে পরিবর্তিত ধারাগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন না করায় ঘন ঘন পরিবর্তন হয়েছে। অবকাঠামোগত, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সমস্যার কারণে আমদানি করা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাথমিক পরিকল্পনায়ও ব্যর্থতা আছে।

সফল হওয়া দেশগুলোর সাধারণ তিনটি নীতি রয়েছে, জ্বালানি খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নির্দেশিকা করা এবং তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা। জ্বালানি ব্যবহারের পরিবর্তনের সাথে মিলিয়ে প্রয়োজনমত পরিবর্তনের সক্ষমতা ও সে অনুযায়ি নীতি নেয়া। এবং সবচেয়ে কার্যকর, প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগে মনোযোগ দেয়া।

জ্বালানি ব্যবহারের পরিবর্তনগুলোর দ্রুত রূপান্তরের কারণে, নীতিমালার অভিযোজনযোগ্যতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ প্রয়োজন। নীতিমালার ঘন ঘন পরিবর্তন বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে। পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত সমাধানকে দেরি করায়। এক দশক আগে জ্বালানি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা এবং রূপান্তর বর্তমান প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর কোনোও নিশ্চয়তা নেই যে পরের দশক এই প্রবণতা আজকের চেয়ে আলাদা হবে না। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গবেষণা করে এবং পরিকল্পিতভাবে চলতে পারলে জ্বালানি খাতের টেকসই উন্নয়ন করা যেতে পারে। এই জাতীয় পদক্ষেপে সবচেয়ে বড় বাধা রাজনৈতিক ও বিশেষ আগ্রহী গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ।

উপ-উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সাবেক অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

এনার্জি বাংলাকে শুভেচ্ছা

BANGLADESH INDEPENDENT POWER PRODUCERS' ASSOCIATION

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শনিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৪২৬, ৭ই ডিসেম্বর ২০১৯

দেশীয় গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি ও আমদানি করা এলএনজির প্রভাব

ড. বদরুল ইমাম

ড. বদরুল ইমাম

দেশের চলমান উন্নয়নে সাশ্রয়ী প্রাথমিক জ্বালানির নিশ্চিত সরবরাহ অত্যাবশ্যক। সে হিসেবে নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পূর্ব থেকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের মাঝে ক্রমাগতভাবে দূরত্ব বাড়তে থাকার ফলে গ্যাসের অবদান ক্রমেই কমে আসতে থাকে। ২০০৯ সালেও যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের অংশ ছিল ৮৮শতাংশ, সেখানে বর্তমানে তা কমে এসে প্রায় ৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। আর এই গ্যাস ঘাটতির প্রভাব মেটানো হয় আমদানি করা জ্বালানি তেলের মাধ্যমে। গ্যাসের পরিবর্তে তেলের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ও দাম বৃদ্ধি ঘটে।

এদিকে নিজস্ব গ্যাসের মজুদ কমে যেতে থাকায় গ্যাস সরবরাহ চালু রাখবার জন্য এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) আমদানি শুরু হয় ২০১৮ সালে মধ্যবর্তী সময় থেকে। ব্যয়বহুল জ্বালানি এলএনজি এনে তা দেশীয় গ্যাসের সাথে মিশ্রিত করে পাইপ লাইনে সরবরাহ করার প্রভাব পড়ে গ্যাসের দামের ওপর। দেশি গ্যাসের মূল্য ইউনিট প্রতি গড়ে প্রায় ৭ টাকার পরিবর্তে এলএনজি মিশ্রিত গ্যাসের খরচ পড়ে গড়ে প্রায় ১২ টাকা। ভর্তুকি দিয়ে কিছুটা দায় সরকার নিলেও এই বর্ধিত দামের এক অংশ সাধারণ জনগণের কাধে এসে ভর করে। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ঘোষিত গ্যাসের দাম গড়ে ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা তারই ফলাফল। শীঘ্রই বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিরও ঘোষণা আসবে বলে সরকারি মহল থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই একদিকে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, অপর দিকে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি - এই দ্বিমুখী মূল্য বৃদ্ধির চাপ এসে পড়েছে সাধারণ ভোক্তাদের ওপর।

এই দাম বৃদ্ধির চাকা যে থেমে থাকবে না তা সহজেই বোঝা যায়। দেশে এলএনজি আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি বর্তমান পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ৬০ কোটি ঘনফুট গ্যাস এলএনজির মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় যা তাড়াতাড়িই ১০০ কোটি ঘনফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তীকালে ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এলএনজি মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৫০ কোটি ঘনফুট ও ২০৩০ সালে প্রায় ৩০০ কোটি ঘনফুট। এই এলএনজি আমদানি ক্রমাগতভাবে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্যকে বৃদ্ধি করতে থাকবে। আর গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি বিদ্যুতের মূল্যকেও বাড়াবে।

কোনো কোনো মহল মনে করেন, বাংলাদেশে গ্যাসের দাম অন্যান্য দেশ, যেমন পশ্চিমা দেশসমূহ থেকে কম। তাই দাম বাড়ানো যুক্তি সংগত। কিন্তু গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করলে জনজীবনে তার ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে। কারণ গ্যাসের দাম বাড়ানোর সূত্র ধরে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি, যানবাহন ব্যবহার করে পরিবাহিত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, বাড়িভাড়া বৃদ্ধি, শিল্পকারখানা থেকে তৈরি দ্রব্যাদি ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তাই গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর বাড়তি খরচের বোঝা এসে পড়ে। পশ্চিমা দেশে গ্যাসের উচ্চমূল্য বহন করার ক্ষমতা সে সব দেশের জনসাধারণের থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের নিম্ন বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিরাট জনগোষ্ঠীর পক্ষে জীবন ধারণের জন্য গ্যাস ও তার সাথে জুড়ে থাকা পণ্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে কিনা সেটিই বিবেচ্য বিষয়।

> কিন্তু আমাদের দেশের নিম্ন বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিরাট জনগোষ্ঠীর পক্ষে জীবনধারণের জন্য গ্যাস ও তার সাথে জুড়ে থাকা পণ্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে কিনা সেটিই বিবেচ্য বিষয়

দেশের নিজস্ব উৎস থেকে গ্যাস সরবরাহ কমে যাবার কারণ হলো গ্যাসের চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত গ্যাসের মজুদ কমে যাওয়া। প্রাপ্ত গ্যাসের মজুদ কমে গেলে সাধারণ প্রথা অনুযায়ী নতুন গ্যাস আবিষ্কারের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়। আর তার জন্য প্রয়োজন হয় জোরালো অনুসন্ধান কাজ। কিন্তু বাংলাদেশে জোরালো অনুসন্ধান কাজের কোন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। গ্যাস অনুসন্ধানে কর্তৃপক্ষের অবহেলা বা অনীহা বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্বলতা।

বাংলাদেশের ভূত্তাত্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এটি বলা যায় যে, দেশের ভূগর্ভে গ্যাস সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত গ্যাস মজুদ কমে গিয়েছে বা শেষ হবার পথে রওয়ানা দিয়েছে তা বলা যেতে পারে, কিন্তু এখনো প্রচুর অনাবিষ্কৃত গ্যাস মাটির নিচে রয়ে গেছে। দেশের নীতি নির্ধারণী মহল এহেন একটি ধারণা দ্বারা তাড়িত হয়েছেন যে, দেশের গ্যাস সম্পদ প্রায় শেষ, সুতরাং বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে হলেও এলএনজি আমদানি করার কোনো বিকল্প নাই।

বিগত ২০ বছরে গ্যাস অনুসন্ধানে নিষ্ক্রিয়তা বা ন্যূনতম উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য নতুন গ্যাস মজুদ আবিষ্কারের ব্যর্থতার কারণ। আর এই ব্যর্থতার ফল স্বরূপ বর্তমানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে বর্তমানে উচ্চ মূল্যে হলেও এলএনজি আমদানি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এই বাড়তি মূল্যের ভার পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বছরগুলোতে এলএনজি আমদানি আরও বৃদ্ধি পাবে। যার হাত ধরে দেশে গ্যাসের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এর ফলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রা কেবলই কঠিনতর হতে থাকবে। অথচ দেশে একটি সুষ্ঠু ও জোরালো গ্যাস অনুসন্ধান কর্মধারা এর একটি সহজতর সমাধান দিতে পারে।

সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক
ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শনিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৪২৬, ৭ই ডিসেম্বর ২০১৯

বিদ্যুৎ খাতে কিছু সংস্কার প্রয়োজন

ড. আহমদ কায়কাউস

আরইবি যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি, তার সাথে কি এটা এখন সঙ্গতিপূর্ণ? না সংঘাতপূর্ণ? যদি বিদ্যুৎকে বাণিজ্যিকভাবে ধরি আবার ভিন্নভাবে সরবরাহ করি, তাহলে তো হবে না। এ জন্য এখন সময় এসেছে ভবিষ্যতের জন্য এটা পর্যালোচনা করার

উচ্চক্ষমতার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন। রাজধানীর আফতাব নগর থেকে তোলা। ছবি : এনার্জি বাংলা

ড. আহমদ কায়কাউস

অতীত থেকে যদি শুরু করি, তাহলে এটা স্পষ্ট হয় যে, এখন বড় একটা পরিবর্তনের সময়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্প সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিষ্কার চোখে পড়ছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে এই পরিবর্তন মোটা দাগে মিলিয়ে দেখা যায়।

১৯০১ সালে প্রথম আহসান মঞ্জিলে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর মাধ্যমে এদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়। তারপর স্বাধীনতার সময় ১৯৭১ সালে মোট স্থাপিত ক্ষমতা ছিল ৫৫০ মেগাওয়াট। তারমানে ৭১ বছরে এই জনপদে ৫৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হয়েছে। এই জনপদ অর্থনৈতিকভাবে প্রযুক্তিগতভাবে কত পশ্চাৎপদ ছিল তা এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়।

এরপর স্বাধীনতার পর থেকে ২০০৯ সাল। ৩৮ বছর। এই ৩৮ বছরে ৩৫০০ মেগাওয়াট। আর এর পরের ১০ বছর ইতিহাস। এই দশ বছর পরে আছে ২২ হাজার ৫৬২ মেগাওয়াট। ৭১ বছর, ৩৮ বছর আর ১০ বছর। তিন অধ্যায়। এটা সরল স্বাভাবিকভাবে হয়নি। বিশেষ উদ্যোগ আর নেতৃত্বের কারণে হয়েছে। এটা হয়েছে অর্থনীতি নিয়ে যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের কারণে।

বিদ্যুৎ খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। পদ্মা সেতুতে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ বলে বলা হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে বিদ্যুতে। শুধু বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) নিজস্ব অর্থে বিনিয়োগ করছে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। এর সব কিন্তু দেশেরই। বেশকিছু প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে করা হয়েছে। এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে এটা আমাদের নিজস্ব সম্পদে হচ্ছে। এর ব্যবস্থাপনা নিজেদের। আর এখানে খুব শক্তিশালী বেসরকারি খাত দাঁড়িয়ে গেছে। এটা কারিগরি ও প্রযুক্তির দিক থেকে খুবই উচ্চমানের।

অর্থনীতিবিদ বা হিসাবরক্ষকদের হিসাব আর রাজনীতিবিদদের হিসাবের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তার বড় প্রমাণ বিদ্যুৎ খাত।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ও খরচটা অনেকে হিসাবরক্ষকের চোখ থেকে দেখেছেন। কেউ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখেছেন। তাঁর কাছে কোনো পরিসংখ্যান ছিল না। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই বাড়তি খরচের প্রভাবে কি হবে। এক কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে অর্থনীতিতে যোগ হয় ৪৬ টাকা। আর এক কিলোওয়াটে খরচ হয়েছে ১০ টাকা।

যখন হরিপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র শুরু করা হচ্ছিল তখন এর বিরুদ্ধে তিনটা নোট পাঠানো হয়েছিল। কারণ ভাবা হয়েছিল বাড়তি খরচের কারণে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাবে। একইভাবে পরে কুইক রেন্টাল করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, এর কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি এসেছে। বহুগুণ প্রভাব পড়েছে। কিন্তু কোনো অর্থনীতিবিদ একথা বলেননি। এর ফলে পুরো দেশ উপকার পেয়েছে। এখানে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো এই কাজ করতে গিয়ে কিছু বাড়তি অর্থ গেছে ঠিকই। কিন্তু সেটা দেখতে হবে কী উপকার পেলাম সেটা কিন্তু ছোট আকারে দেখার সুযোগ নেই।

আমরা সব সময় খুব মান সম্মত আন্তর্জাতিক ক্রয় পদ্ধতি চিন্তা করছি। বর্তমান পদ্ধতি কিন্তু কেনা-কাটায় গতি এনেছে। কাজ করার গতি এনে দিয়েছে।

বেসরকারিখাতের মধ্যে বিদ্যুৎ ও টেলিকম সব থেকে এগিয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে দুটো খাতই সফল। তবে টেলিকম বিদেশি উদ্যোক্তারা করেছে। আর বিদ্যুৎ খাত করেছে স্থানীয়, দেশীয় উদ্যোক্তারা। তাই বলতে হবে, বিদ্যুতের সফলতা বেশি।

এই সফলতা ধরে রাখতে বিদ্যুৎ খাতের কিছু বিষয় পর্যালোচনার সময় এসেছে। নতুন করে চিন্তা করার দরকার। এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে। যেমন, চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক এলাকা। সেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থাপনা ভালো। যদিও লোডশেডিং আছে। সেখানে সিস্টেম লস ডেসকো ডিপিডিসি'র মতোই। গ্রাহকও প্রায় সমান। হইতো চট্টগ্রামে বেশিই হবে। চট্টগ্রাম একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে চলে। আর ডেসকো বা ডিপিডিসি কোম্পানি করা হয়েছে। সেখানে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কয়েকজন নির্বাহী পরিচালক আছেন। আছে বোর্ড। তারা কোটি টাকা ছাড় করতে পারে। এটা কি ন্যায় সঙ্গত? এটাকে যথাযথ নীতি আমি বলবো না। সিলেটে একজন চীফ ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছেন। নেসকো এলাকায় আগে যেখানে একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সব করত এখন সেখানে বোর্ড আছে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেবা কী বেড়েছে। উন্নত হয়েছে? দুই স্থানে কী আলাদা করে পরিষ্কার পার্থক্য বোঝা যায়? এখন এগুলো পর্যালোচনা করার সর্বোচ্চ সময়।

আরেকটা বিষয় হলো আরইবি। আরইবি করা হয়েছে শুধু গ্রামে বিদ্যুৎ দেয়ার জন্য। সেজন্য তারা ভর্তুকিও পাচ্ছে। কিন্তু এখন তারা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এমনকি শিল্পে দিচ্ছে। গাজীপুরে যখন আরইবি শুরু করে তখন সেটা ছিল গ্রাম। এখন সিটি কর্পোরেশন। আরইবি যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি, তার সাথে কি এটা এখন সঙ্গতিপূর্ণ? যদি বিদ্যুৎকে বাণিজ্যিকভাবে ধরি আবার ভিন্নভাবে সরবরাহ করি তাহলে তো হবে না। এজন্য এখন সময় এসেছে ভবিষ্যতের জন্য এটা পর্যালোচনা করার।

সিনিয়র সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ

SUMMIT

Summit accepts USD 330 million investment from JERA

During the Honourable Prime Minister's state visit to Japan on May 29, 2019

“Much needed technology and capital for Bangladesh's fast growing power and energy market will be available from JERA with their vast knowledge and balance sheet.”

Muhammed Aziz Khan
Founder Chairman of Summit Group

www.summitpowerinternational.com

“গ্যাসে জাতীয় সম্পদ। এর অপচয় রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন”

দেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিজিএফসিএল গ্যাস উত্তোলন এবং গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

আমাদের ৬টি গ্যাস ফিল্ড রয়েছে ঃ

১. তিতাস
২. বাখরাবাদ
৩. হবিগঞ্জ
৪. নরসিংদী
৫. মেঘনা
৬. কামতা

দেশের মোট সরবরাহকৃত গ্যাসের সিংহ ভাগ আমরাই উৎপাদন করছি

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)
Bangladesh Gas Fields Company Ltd.
(A Company of Petrobangla)

RURAL POWER COMPANY LIMITED

Committed to enhance socio-economic development in rural areas of Bangladesh through reliable power generation

Rural Power Company Ltd. (RPCL) was registered as a Public Limited Company from the Registrar of Joint Stock Companies & Firms on 31 December 1994 to alleviate severe power crisis of the Country. The Company was promoted by REB and 5 (Five) Palli Biddyut Samities (PBSs). The Company is presently generating 392 MW of Electricity from its 4 (Four) Power Plants namely- 1) Mymensingh 210 MW Combined Cycle Power Station, 2) Gazipur 52 MW Dual-Fuel Power Plant, 3) Raozan 25 MW Dual- Fuel Power Plant & 4) Gazipur 105 MW HFO Fired Power Plant. Present Shareholders of the Company are BREB & 13 PBSs.

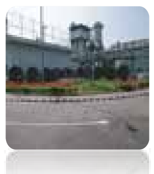

Mymensingh 210 MW Power Station

Gazipur 52 MW Dual-Fuel Power Plant

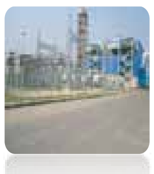

Raozan 25 MW Dual-Fuel Power Plant

Gazipur 105 MW HFO Fired Power Plant

1. Mymensingh 210 MW Combined Cycle Power Station:

RPCL has been generating 210 MW of electricity from Mymensingh Power Station (MPS) at Shambhuganj, Mymensingh. MPS, in Phase-I, installed 70 MW Gas Turbine (GT) Generator, Commissioned in July 2000, in Phase-II, installed another 70 MW Gas Turbine (GT) Generator, Commissioned in April 2001 and in Phase-III, installed 70 MW Steam Turbine Generator (STG), Commissioned in July 2007. Presently Mymensingh Power Station is a Combined Cycle Power Plant with a capacity to generate & supply 210 MW of electricity.

2. Gazipur 52 MW Dual-Fuel Power Plant:

To expand the Company's operational capacity and business, RPCL constructed 52 MW Dual-Fuel Power Plant at Kadda, Gazipur. The construction work of the power plant was started in August 2010 and commissioned in July 2012. A Power Purchase Agreement (PPA) was signed with Bangladesh Power Development Board (BPDB) in June 2012.

3. Raozan 25 MW Dual-Fuel Power Plant:

To meet severe power crisis of the country, Government has taken short, mid and long term initiatives. As a part of these initiatives, RPCL has constructed 25 MW Dual-Fuel Power Plant at Raozan, Chattagram. An Engineering, Procurement & Construction (EPC) contract was signed in March 2011 and the Plant Commissioned in May 2013. PPA was signed with BPDB in October 2013.

4. Gazipur 105 MW HFO Fired Power Plant:

By the Directives of Power Division, the Company has established 105 MW HFO Fired Power Plant at Kadda, Gazipur. An EPC contract was signed in September 2017 and the Plant was Commissioned in May 2019. PPA was signed with BPDB in April 2019.

Joint Venture Power Plant: “B–R Powergen Ltd.” – a joint venture company of BPDB and RPCL has successfully completed 150 MW Dual Fuel Power Plant at Kadda, Gazipur and started commercial operation in August 2015.

Up-coming Projects: In line with the Government's Power System Master Plan, RPCL has undertaken strategy to enhance its generation capacity upto 2,730 MW by 2030. The Company has taken steps to install 1320 MW Coal based Power Plant at Kalapara, Patuakhali, 420 MW Dual Fuel (Gas/HSD) Combined Cycle Power Plant (CCPP) at Shambhuganj, Mymensingh and 600 MW LNG/Gas based CCPP at Gazaria, Munshigonj. The Company has given extra thrust on Solar and Wind based Power Plants.

Corporate Office: House # 19, Road # 1/B, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka – 1230
PABX : 02-48957952, FAX: 02-48963229, Web: www.rpcl.gov.bd

জ্বালানির ন্যায়সঙ্গত দাম জরুরি

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

যে কোনো জিনিসের দাম সম্পদের বণ্টনে প্রভাব ফেলে। ফলে গ্যাসের যথেচ্ছা ব্যবহার হলো। এতে এখন একটা সংকটে এসে পৌঁছেছি। আমাদের এলএনজি'র দাম ভারতের চেয়ে বেশি। আমদানি দামটা যথার্থ না হলে শিল্পে ও মানুষের জীবনে এর প্রভাব পড়বে।

বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করুন

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

জ্বালানির খরচটা শিল্পে বিনিয়োগ ও মানুষের জীবন যাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। খরচটা টেকসই করতে 'অবচয় প্রিমিয়াম' রাখতে হবে। একই সাথে অপচয় কমাতে হবে। জ্বালানি দুই রকমের হতে পারে। একটা দেশীয় আর একটা আমদানি করা। দুটোরই খরচকে মূল বিবেচনায় আনতে হবে। দেশের হলে উৎপাদন খরচ, আর আমদানি করা হলে আমদানি খরচ। কিন্তু যদি দেশীয় হয় তাহলে এতে একটা বেশি যোগ হয়। তাহলো 'অবচয় প্রিমিয়াম'। কারণ সম্পদ তো একসময় শেষ হয়ে যাবে। তখন এই প্রিমিয়াম দিয়ে নতুন জ্বালানির সংস্থান করা যাবে। আমদানি জ্বালানির জন্য এটা লাগবে না।

দেশীয় সম্পদ শেষ হয়ে গেলে নতুন জ্বালানিতে যেতে হবে। যা বেশি দামের বা অন্য কোন জ্বালানিতে যেতে হবে। তখন নতুন বিনিয়োগ লাগবে। মূলত সেটাকে মোকাবেলা করার জন্য 'অবচয় প্রিমিয়াম' নির্ধারণ করতে হবে। তখন এই সস্তা দামে জ্বালানি পাওয়া যাবে না। দেশের সম্পদ তুলতে নতুন খনন করতে হবে। সেটার জন্য আবার বিনিয়োগ লাগবে। এর জন্য অবচয় প্রিমিয়ামের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু আমরা সে রাস্তায় যাইনি। সে রাস্তায় না গিয়ে জ্বালানি সস্তা রাখা হলো। সস্তা রেখে দেয়ার ফলে সেটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। একটা সময় গেছে যখন আমাদের সবাইকে বাধ্য করা হয়েছে গ্যাস ব্যবহারের জন্য। যাদের লাগবে না তাদেরও দেয়া হয়েছে। গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এর দাম কম রাখা হয়েছে।

গ্যাসের দামটা দুটো জিনিসের নির্দেশনা দেয়। এর দাম সম্পদের হিসাব আর জীবনমান নির্ধারণ করে। গ্যাস সস্তা হওয়ার কারণে যেখানে ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল, সেখানে হয়নি, আর যাদের খুব দরকার তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পায়নি। দক্ষ ইঞ্জিন হয়নি, প্রচুর অপচয় হয়েছে। যে কোনো জিনিসের দাম সম্পদের বণ্টনে প্রভাব ফেলে। ফলে গ্যাসের যথেচ্ছ ব্যবহার হলো। এতে এখন একটা সংকটে এসে পৌঁছেছি আমরা। এখন আমদানি দামটা যদি যথার্থ না হয়, তবে শিল্পে ও মানুষের জীবনে এর প্রভাব পড়বে। অতিরিক্ত কম হতে পারবে না আবার অতিরিক্ত বেশি হতে পারবে না। প্রয়োজনীয় জায়গাতে ব্যবহার না হলে শিল্প উন্নয়ন কমে যাবে।

এলএনজি আমদানিতে জাহাজ ভাড়া, পরিবহন ইত্যাদি খরচের বিশ্বজুড়ে একটা মানদণ্ড আছে। সেই মানদণ্ডের বিচারে ভারতের চেয়ে আমাদের দাম বেশি। আমাদের দাম পাকিস্তানের মতোই বেশি। তবে পাকিস্তানের দাম উদাহরণ হতে পারে না। এটা হয়তো এমন হতে পারে যে, প্রথমবার আমদানি করতে গিয়ে বেশি পড়েছে। কিন্তু এখন এ দাম যথার্থ করতেই হবে।

এখন কথা হচ্ছে, এগুলো দেখবে কে? দামগুলো দেখার জন্য রেগুলেটরি কমিশন হলো। বিইআরসি করা হয়েছিল এ জন্য যে, এখানে সরকার, উৎপাদক, ক্রেতা – সবাই মিলে দাম নির্ধারণ করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা হয়নি। বিইআরসিতে বিতরণ কোম্পানিগুলো দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে আর তা বাতিল হয়েছে এমন নজির নেই। একবার শুধু দাম বৃদ্ধি স্থগিত করা হয়েছে নির্বাচনের কারণে।

'রেগুলেটরি ক্যাপচার' বা নিয়ন্ত্রককে আয়ত্তে আনা বলে একটা শব্দ আছে। যাদের আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন, তারা আপনাকে আয়ত্তে নিয়ে নিল। তাদের হাতে আপনি জিম্মি। এটা সব ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে পুঁজিবাজার জিম্মি কিছু ম্যানিপুলেটরের কাছে। এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

যদি সত্যিকারের দাম নির্ধারণ হয় তবে সবাই দেবে। কিন্তু অদক্ষতার জন্য, দুর্নীতির জন্য যদি দাম বেশি হয় তবে তা ঠিক হবে না। দুর্নীতি আর অদক্ষতার দায় গ্রাহক নিতে পারে না। এই জন্য বিইআরসির কিছু সংস্কার প্রয়োজন। তারা গ্রাহকদের শুনানি করে। সেখানে গ্রাহকদের প্রস্তাব দেয়ার ক্ষমতা নেই। এটা থাকা উচিত। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম কমলে গ্রাহককে দাম কমানোর প্রস্তাব দেয়ার ক্ষমতা দেয়া উচিত। বিইআরসিতে গ্রাহক, জ্বালানিবিষয়ক অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা, সরবরাহকারী সবার প্রতিনিধি থাকা উচিত।

ভারতে নির্দিষ্ট সময় পরপর দাম বাড়ে না। কিছু সূচকের সাথে দাম নির্ধারণ সম্পৃক্ত করা হয়। সূচকের সাথে দাম ওঠানামা করে। এটা তো অন্য পণ্যের মতোই। চাল ডাল তেলের দাম ওঠানামা করতে পারলে এটা হবে না কেন?

জ্বালানি দামটা নির্ধারণ প্রক্রিয়া নতুনভাবে চিন্তা করার, ঢেলে সাজানোর এখনই সময়। সব সময় আমাদের একটা জুজুর ভয় দেখানো হয়। কিন্তু ঠিকমত সিদ্ধান্ত নিলে জুজুর ভয় কেটে যায়। অন্যদেশের জনগণ যদি আন্তর্জাতিক দাম দিয়ে জীবনযাপন করতে পারে, তবে আমরা পারব না কেন? অনেক ক্ষেত্রে এগুলো জুজুর ভয়। পৃথিবীতে আমাদের মতো করে দাম নির্ধারণ আর কেউ করে না। আমাদের ব্যবসায়ীরা তো আলাদা না। আমাদের জনগণ তো আলাদা না।

সব মিলিয়ে আমাদের এখন সময় এসেছে সব ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত, যোগ্য দাম নির্ধারণের। আর তার জন্য প্রয়োজন ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন বা ঢেলে সাজানো।

অধ্যাপক, গবেষক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শনিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৪২৬, ৭ই ডিসেম্বর ২০১৯

অনন্য মাইলফলক রূপপুর

মো. আনোয়ার হোসেন

মো. আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে এখন এক উদীয়মান অর্থনীতির দেশের নাম। বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয় আর ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে চলছে। এ সংকল্প বাস্তবায়নে চাই জ্বালানি। দারিদ্র্য বিমোচন, জীবন মান উন্নয়ন থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি উন্নয়নের জন্য সহজলভ্যতা জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অন্যতম পূর্বশর্ত।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে বড় উপায় প্রাকৃতিক গ্যাস। কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত গ্যাসের মজুদ নেই। সেই কারণে জাতীয় জ্বালানি ব্যবহারে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমানো হচ্ছে। অন্য সব উৎসের সাথে পারমাণবিক বিদ্যুতের মত নির্ভরযোগ্য, সস্তা ও উন্নত জ্বালানি নির্ভর হতে যাচ্ছে দেশ।

রাশিয়ায় তৈরি হচ্ছে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের টারবাইনসহ অন্য যন্ত্র। ছবি : সংগৃহিত

পারমাণবিক জ্বালানি পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত তো করেই। পাশাপাশি পরিষ্কার, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে। তাই, পারমাণবিক শক্তিবিহীন অনেক দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা না বাড়িয়ে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে এখন পারমাণবিক বিদ্যুতের দিকে ঝুঁকছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রচলিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে ভিভিইআর-১২০০ পারমাণবিক চুল্লির জীবনকাল প্রায় ৬০ বছর। যা কিনা ৮০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রাথমিক বিনিয়োগ একটু বেশি দেখালেও দীর্ঘমেয়াদে অনেক সস্তা।

পাবনার রূপপুরে বাংলাদেশ যে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করছে তা শুরু থেকেই নিবিড়ভাবে তদারকি করছে আন্তর্জাতিক পারমানবিক শক্তি সংস্থা বা আইএইএ। সকল ধাপের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইএইএ বিভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। বাংলাদেশই প্রথম দেশ যে কিনা তার প্রথম পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে আইএইএ-এর ১৯টি অবকাঠামোগত বিষয়ের মাইলফলক সব পূরণ করেছে।

২০৪১ সালের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ থেকে দেশের মোট বিদ্যুতের প্রায় ১২ শতাংশ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে।

রূপপুর থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করার জন্য পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ (পিজিসিবি) সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও উন্নয়ন করে চলছে। এছাড়া স্ব স্ব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ আবাসিক এলাকা, যোগাযোগ, নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ করছে। আগামী একশ' বছরের জীবনকাল হিসাব করে যে কোন হুমকির কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অবকাঠামোগত সুরক্ষা ব্যবস্থা (পিপিএস) নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নিউকিয়ার সিকিউরিটি এন্ড ফিজিকাল প্রটেকশন সেল (এনএসপিসি) গঠন করা হয়েছে। এই সেল রূপপুরের জরুরি বিষয় থেকে শুরু করে তদারকি ও নজরদারি, পারমাণবিক সুরক্ষা, পারমাণবিক পদার্থের হিসাবরণ এবং সংবেদনশীল তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ, পরিবহন ও পরিচালনাসহ সকল ক্ষেত্রে সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ যে কোনো দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অনন্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ তার প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সঠিক পথেই আছে এবং পর্যাপ্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জলবায়ু তহবিল এবং আমাদের করণীয়

ড. এসএম মনজুরুল হান্নান খান

ড. মনজুরুল হান্নান খান

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অগ্রগণ্য। এতে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বন্যা, সাইক্লোন, নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। বাড়ছে আর্থিক ক্ষতি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দরিদ্র্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠি। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে অভিযোজিত হবার আর্থিক সক্ষমতা এসব মানুষের নেই।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে প্রশমন। যার মানে হচ্ছে, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনা। এসকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে প্রয়োজন বিশাল অর্থের বিনিয়োগ। কিন্তু আমাদের অর্থনীতি এই খরচ বহন করার ক্ষমতা এখনো তৈরি হতে পারেনি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কিভাবে এই অর্থ খরচ হতে পারে সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশের গরীব এবং প্রান্তিক মানুষ, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অসহায়, তাদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য প্রথমে তাদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন জীবিকায় যাতে সে অভ্যস্ত হতে পারে তার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। টেকসই বাসস্থান এবং অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে। এসব কাজে অনেক অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ বাংলাদেশ সরকারের একার পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। আবার যদি কলকারখানা, ইটভাটা, যানবাহনকে পরিবেশ বান্ধব করতে চাই তাহলে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন। শিল্প এবং অন্যান্য খাত থেকে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে হলে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের শিল্প কারখানাকে পরিবর্তন করতে হবে। এই প্রযুক্তি সাধারণ থেকে উচ্চমূল্যে সংগ্রহ করতে হয়, এতে পরিচালনা ব্যয় বেশি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগকারীর এধরণের প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি অনীহা থেকেই যায়। তাই এসকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীকে নানা ধরনের প্রণোদনা দিয়ে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে হবে।

অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্থ না করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশমন এবং অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান করা কষ্টসাধ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব। এই অবস্থায় অনুসন্ধান করতে হবে বিকল্প তহবিলের। যাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জলবায়ু রক্ষার কাজ পাশাপাশি চালিয়ে যাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক তহবিল হচ্ছে 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' বা 'জলবায়ু তহবিল'। ২০১০ সালে এই তহবিল গঠন হয়, আর ২০১৫ সাল থেকে কাজ শুরু করে। এখানে ২০২০ সালে ১০ হাজার কোটি ডলার সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার সংগ্রহ হয়েছে। এই তহবিল বাংলাদেশের জন্য খুবই সহায়ক হতে পারে। এখান থেকে অর্থ নিয়ে আমাদের অভিযোজন এবং প্রশমন কাজ করা যেতে পারে। তবে এই তহবিল থেকে অর্থ প্রাপ্তি বেশ জটিল। অর্থছাড় হয় শুধু অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে। অনুমোদন পেতে পারে সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়, আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক যে কোন সংস্থা।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বাংলাদেশের জন্য এই তহবিল পেতে জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষ। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং ইডকল এই তহবিল পাওয়ার অনুমোদিত সংস্থার মর্যাদা পেয়েছে। এটা আমাদের বড় সুযোগ। কারণ অনুমোদিত এই সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে তহবিল পেতে পারি। এরজন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত সংস্থার সাথে যৌথভাবে প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয়া। আর একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যৌথ অর্থায়ন। অনুমোদিত সংস্থাকেই এই অর্থায়ন খুঁজে বের করতে হবে। প্রকল্প বাজেটের ঠিক কত অংশ যৌথ অর্থায়ন হবে সেটা প্রস্তাবনায় উল্লেখ থাকতে হবে। জলবায়ু তহবিল সাধারণত অনুদান, ঋণ, সম্পদ কিংবা জামানত হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

জলবায়ু তহবিল থেকে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত তিনটে প্রকল্পে মাত্র সাড়ে আট কোটি ডলার অর্থ পেয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রস্তুতি বাবদ অনুমোদন পেয়েছে ৩৯ লাখ ডলার। বাংলাদেশের এই তহবিলের অর্থ পেতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাস্তবায়নে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এখন আমাদের জরুরি হচ্ছে যথাযথ প্রকল্প জমা দেয়া এবং দেনদরবার করে তা অনুমোদন করানো।

অতিরিক্ত সচিব
পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়

সাংবাদিক
সাগর সরওয়ার
ও
মেহেরুন রুনী
হত্যার
বিচার
চাই

প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের জাতীয় সম্পদ
এর অপচয় রোধ করুন

আপনি জানেন কি?

- যানবাহনে সর্বোচ্চ পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি CNG ব্যবহার ঢাকাসহ সারা দেশকে ভয়াবহ বিষাক্ত বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা করছে।
- বর্তমানে মোট গ্যাস উৎপাদনের ৫% এর কম পরিমান প্রাকৃতিক গ্যাস CNG খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- সরকার CNG খাত থেকে মোট গ্যাস মূল্যের প্রায় ২২% এর বেশি রাজস্ব পাচ্ছে।
- যানবাহনে CNG ব্যবহার করি, দেশের টাকা দেশে রাখি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত দেশ গড়ি।

বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড
কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ
বাড়ছে বিদ্যুৎ হচ্ছে উন্নয়ন গড়ছে
বাংলাদেশ

জাতীয় উন্নয়নে মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইজিসিবি লিঃ অঙ্গীকারবদ্ধ
ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ
(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)
ইউনিক হাইটস (লেভেল-১৫ ও ১৬), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১২১৭।
www.egcb.com.bd; mail: info@egcb.com.bd

নির্মাণাধীন পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লা মজুদাগার। ছবি : এনার্জি বাংলা

উপকূলের মানুষের চোখে নতুন আলো, নতুন স্বপ্ন

জিন্নাতুন নূর

বদলেছে, বদলাচ্ছে, বদলাবে। তাই উপকূলের মানুষের চোখে নতুন আশার আলো। নতুন স্বপ্ন ঐ জনপদে। জীবনমান আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন তাদের দোড়গোড়ায়। কক্সবাজার থেকে মোংলা। পুরো উপকূলে শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া। পায়রা, মাতারবাড়ী আর রামপাল। সমুদ্র উপকূলে যে বড় তিনটে বিদ্যুৎকেন্দ্র হচ্ছে তা ঘিরে এই পরিবর্তন। তিন বিদ্যুৎকেন্দ্র উপকূলের মানুষের স্বপ্ন বদলে দিয়েছে।

জানুয়ারিতেই পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হবে। রামপালের প্রায় ৫০ ভাগ কাজ শেষ। মাতারবাড়ীও এগিয়ে চলেছে সমানতালে। তিনটে কেন্দ্রই চলবে আমদানি করা কয়লা দিয়ে, আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে। এগুলো চালু হলে বিদ্যুতের গড় উৎপাদন খরচ কমবে।

১৩২০ মেগাওয়াটের পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানি শুরু হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের হাতের ছোঁয়ায় পূর্ণতা পাচ্ছে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র। সম্প্রতি এই এলাকার মানুষের কাজ বেড়েছে। বেড়েছে আয়। বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়তে বিক্রেতাদের কেউ কেউ রপ্ত করছেন চীনা ভাষা। তাই যোগাযোগ হচ্ছে আন্তঃসংস্কৃতিরও। নয় হাজারের মধ্যে আড়াই হাজার চীনা আর সাড়ে ছয় হাজার দেশি শ্রমিক গড়ে তুলছেন এই কেন্দ্র।

ইন্দোনেশিয়া থেকে যে কয়লা আসছে তার প্রতি টনের দাম ৫৫ ডলার। আর এই মূল্যে কয়লা আনলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ হবে প্রায় ৬ টাকা ৩৬ পয়সা। ৬৬০ মেগাওয়াটের এক ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিদিন প্রয়োজন হবে সাড়ে ছয় হাজার টন কয়লা। কয়লা মজুদাগার (কোলডোম) হবে ছয়টা যেখানে দুই মাসের প্রয়োজনীয় বাড়তি কয়লা মজুদ থাকবে। এ পর্যন্ত দুইবার কয়লা এসেছে। প্রতিবার ২০ হাজার টন করে কয়লা আনা হয়েছে ইন্দোনেশিয়া থেকে।

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ. এম খোরশেদুল আলম জানান, বিদ্যুৎকেন্দ্রের সব অবকাঠামো নির্মাণ প্রায় শেষ। এখন শুধু সঞ্চালন লাইনের অপেক্ষা। ভবিষ্যতে এখানে মোট ২৬৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে। এ ছাড়া ৫০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎও করা হচ্ছে।

প্রকল্প পরিচালক শাহ আবদুল মাওলা বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। নদীর নাব্য না থাকায় জাহাজ ভরে কয়লা আমদানি করা যাচ্ছে না। এটা সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচে প্রভাব ফেলবে।

চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের (সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল সেন্টার) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার কি ইউয়ে বলেন, এখানে চীনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব, স্থানীয় মানুষের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।

ইউএন এসকাপের জ্বালানি শাখার সভাপতি মোহাম্মদ হোসাইন

ইবি প্রতিবেদক

টেকসই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি জ্বালানি এবং তার নিরবচ্ছিন্ন যোগান। বিশ্বব্যাপী জ্বালানির চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের ব্যবহার করা মোট জ্বালানির অর্ধেকেরও বেশি ব্যবহার করছে। এই অঞ্চলে ৩২ কোটি ৫০ লাখের বেশি লোক এখনো বিদ্যুৎবিহীন। ১৯৮ কোটি মানুষ রান্নার কাজে নিরাপদ চুলা বা স্বাস্থ্যকর জ্বালানির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত। ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদাপূরণ এবং সর্বজনীন বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব, সামাজিকভাবে নিরাপদ এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় জ্বালানি খাতের বিকাশ নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ।

জাতিসংঘের এসকাপের জ্বালানি শাখা টেকসই উন্নয়নের সপ্তম লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং সর্বাধুনিক জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে জ্বালানি সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় সংযোগ বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

এসকাপ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জ্বালানি বিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলন ও সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করে। সাথে সাথে জ্বালানির প্রাপ্যতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং জ্বালানি দক্ষতাকে এগিয়ে নিয়ে টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থায় পরিণত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা করে। এসকাপের জ্বালানিবিষয়ক কার্যাবলী প্রধানত তিনটি পর্যায়ে পড়ে। আর তাহলো - আন্তঃদেশীয় কার্যাবলি, জ্ঞানচর্চায় গবেষণামূলক কার্যাবলির জন্য এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।

গত অক্টোবর মাসে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন এসকাপের জ্বালানিবিষয়ক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য এটা অনেক গর্বের বিষয়।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৭ বাস্তবায়নে এসকাপ মিনিস্টারিয়াল ডিক্লিয়ারেশনের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে এই কমিটি গঠিত হয়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে জ্বালানি খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। কমিটির মেয়াদ ২ বছর। ইউএন এসকাপের ৫৫টি সদস্য রাষ্ট্র, ৯টি সহযোগী সদস্য রাষ্ট্র, ২২টি স্থায়ী পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র এবং ২৪টি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা নিয়ে এই কমিটি গঠিত।

ইউএন এসকাপের জ্বালানি শাখার সভাপতি ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক এনার্জি বাংলাকে বলেন, নতুন কমিটির মাধ্যমে ইউএন এসকাপ জ্বালানি খাতে তার সদস্য দেশ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার জন্য যুগোপযোগি টেকসই জ্বালানির আঞ্চলিক বিকাশ, পারস্পরিক জ্বালানি সংযোগের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে চলেছে। এর গবেষণামূলক কাজ অত্র অঞ্চলে জ্বালানি সমস্যা থেকে ঘুরে দাঁড়াবার একটি বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা দেবে যা এই অঞ্চলে টেকসই জ্বালানির জন্য ভবিষ্যতের পথকে মসৃণ করবে।

ইউএন এসকাপের নতুন সদস্যরা। সবার বামে বসা মোহাম্মদ হোসাইন। ছবি : সংগৃহিত

পলিথিন থেকে জ্বালানি তেল

১২ পৃষ্ঠার পর

নাসিক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভি বলেন, খুব তাড়াতাড়িই এক টন ক্ষমতার আরও একটি প্ল্যান্ট বসানো হবে। যা দিয়ে দিনে ৫০০ লিটার তেল উৎপাদন করা যাবে। পরিবেশ রায় ইতিমধ্যে এ ধরনের অনেক প্রকল্প নেয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে এ ধরণের যে কোন প্রকল্পে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলেও তিনি জানান।

মেঘা অর্গানিক বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন, স্থাপন করতে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা। প্রথম করায় খরচ কিছুটা বেশি। তবে এখন দুই লাখ টাকার মধ্যে সম্ভব। তেলের মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতকরণের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের বিষয়ে গবেষণা চলছে। গবেষণা শেষে খুব তাড়াতাড়ি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাব। মেঘা অর্গানিক প্রতিষ্ঠানটি মূলত বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন করে। কক্সবাজার ও কেরানীগঞ্জে তাদের দুটো বর্জ্য থেকে সার উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

বিশ্বজুড়েই পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্য ইতিমধ্যে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে স্বীকৃত, যা পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। এসব বর্জ্য পরিবেশের সাথে মিশে যায় না। হাজার বছর অবিকৃত থাকে। আর মাইক্রো প্লাস্টিক ইতিমধ্যে পশু প্রাণি থেকে শুরু করে মানব দেহে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। শুধু ঢাকা শহরেই প্রতিদিন প্রায় ৯০ লাখ প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার হয়। যার মাত্র ১০ ভাগের ঠিকানা হয় ডাস্টবিনে। ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সমস্ত পলিথিন ও প্লাস্টিক অপসারণ ও তা থেকে জ্বালানি উৎপাদন নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক হতে পারে।

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শনিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৪২৬, ৭ই ডিসেম্বর ২০১৯

বর্জ্য পলিথিন থেকে জ্বালানি তেল

মাহফুজ রিশাদ

নারায়ণগঞ্জে বর্জ্য পলিথিন থেকে জ্বালানি তৈরির কারখানা। ছবি : এনার্জি বাংলা

ফেলে দেয়া বা পরিবেশ দূষণকারী বর্জ্য পলিথিন ও প্লাস্টিক থেকে মূল্যবান জ্বালানি তেল তৈরি হচ্ছে। তা দিয়ে চলবে গাড়ি, কারখানার চাকা। এই তেল উৎপাদন করছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক)। প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭০ লিটার তেল উৎপাদন করা হচ্ছে ফেলে দেয়া পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত নানা বর্জ্য থেকে।

মাত্র তিন মাস হলো নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটীতে নাসিকের 'ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্স রিকভারি সেন্টারে (আইআরআরসি)' পলিথিন থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদন করা হচ্ছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেঘা অর্গানিক বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে পলি কার্বণ থেকে জ্বালানি তেল তৈরির এ উদ্যোগ। এই ছোট কেন্দ্র থেকে একবারে প্রায় ৫০ কেজি বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে ৩০-৩২ লিটার অশোধিত তেল, কিছু গ্যাস ও কার্বণকালি উৎপাদন করা যায়। প্রতি ৩০ লিটার অশোধিত তেল শোধন করে ১৫-১৬ লিটার অকটেন, ৭-৮ লিটার পেট্রোল এবং কিছু ডিজেল করা হচ্ছে।

উপযুক্ত নিষ্ক্রিয় পরিবেশে বা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পলি-কার্বনকে উচ্চচাপ ও তাপে উত্তপ্ত করলে তা ভেঙে পেট্রোলিয়াম তেল হয়। আর এ প্রক্রিয়া পাইরোলাইসিস নামে পরিচিত। প্লাস্টিক থেকে জ্বালানি তেল তৈরির জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এ পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল উৎপাদনের প্রক্রিয়া বর্তমানে জনপ্রিয় হচ্ছে।

৫০ কেজি বর্জ্য থেকে অপরিশোধিত তেল ও অন্যান্য উপজাত পেতে সময় লাগে ৭-৮ ঘণ্টা। সে হিসাবে দিনে দুইবার চালানোর জন্য উপযোগী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এটা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কেবল একজনই যথেষ্ট। প্রথমে উপযুক্ত ও পরিষ্কার পলিথিন ও প্লাস্টিক দ্রব্য বয়লারে দেয়া হয়। এরপর আগুন জ্বালিয়ে প্রথম এক ঘণ্টা ঝুট জাতীয় কাপড় ব্যবহার করে বয়লারকে উত্তপ্ত করা হয়। এরমধ্যেই সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্যাস উৎপাদন করতে শুরু করে যা আরেকটি নলের মাধ্যমে বয়লারের নিচে পাঠানো হয়। অর্থাৎ প্রথম প্রায় এক ঘণ্টা পর এখানে উৎপাদিত গ্যাস দিয়েই বয়লারটি পরবর্তী ৬-৭ ঘণ্টা চলতে পারে।

নাসিক প্রতিদিন এখানে ৮-১০ টন ময়লা আবর্জনা সরবরাহ করে। সেই বর্জ্য থেকে সাকুল্যে ২০-৩০ কেজি পলিথিন বা প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। যা যথেষ্ঠ নয় বলছিলেন মেঘা অর্গানিকের পঞ্চবটি শাখার প্রকল্প পরিচালক সৌরভ হোসেন সোহাগ। 'এ কারণে সরাসরি জনগণের কাছে থেকে পলিথিন, প্লাস্টিক কেনার প্রচারণা শুরু করি। আমাদের এখানে এসে যে কেউ পলিথিন ও প্লাস্টিক ১৫-২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে পারেন,' বলেন সৌরভ হোসেন।

পরিশোধিত তেল পরীক্ষামূলকভাবে সৌরভ হোসেন তার নিজের মোটর বাইকে ব্যবহার করেন এবং এখন পর্যন্ত তিনি সফলভাবে ব্যবহার করে চলছেন।

সব মিলে অকটেনের উৎপাদন মূল্য লিটার প্রতি ৫০-৫৫ টাকা। এই অকটেন তারা খোলা বাজারে ৭০-৭৫ টাকা করে বিক্রি করেন। উন্নত রিফাইনারি মেশিন ব্যবহার করলে এই দাম আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে চীন থেকে আধুনিক রিফাইনারি মেশিন কেনা হয়েছে। যা কিছু দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

এরপর ১১ পৃষ্ঠায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি: সাইফুল ইসলাম কল্লোল

ইবি প্রতিবেদক

(বৃহস্পতিবার, ২৮ নভেম্বর) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাত-দিন কাজ হচ্ছে। অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বলে গ্রিড লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে সৌর প্যানেলের মাধ্যমে সেখানে আলোকিত করেছি।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় 'মুজিববর্ষ' উদযাপনকালে প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালাবার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশের একটি ঘরও অন্ধকার থাকবে না। প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলবে। কাজের গতি বাড়বে, কাজের সময় বাড়বে। বিদ্যুতের আলোয় কাজ হবে।

পার্বত্য এলাকায় ১৩ হাজার ৭০৪টি সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। এতে খরচ হয়েছে ৭৬ কোটি ৬ লাখ ৩১ হাজার টাকা। তিন পার্বত্য জেলার ২৬ উপজেলার ১২৮টি ইউনিয়নের এক হাজার ৯২৭টি গ্রাম বা পাড়ায় ১১ হাজার পরিবারের কাছে এই সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। আরও ৪০ হাজার পরিবারকে সৌর প্যানেলের আওতায় এনে পার্বত্য এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। এতে ২১৮ কোটি টাকা খরচ হবে।

BANGLADESH-CHINA POWER COMPANY (PVT.) LIMITED
(A Joint Venture of CMC and NWPGCL)
UTC Building (Level # 5), 8 Panthapath, Kawran Bazar, Dhaka-1215, Bangladesh.
Phone No. 9143908, 9140757. Web: www.bcpcl.org.bd, Email: info@bcpcl.org.bd

উপদেষ্টা সম্পাদক : **অরুণ কর্মকার**   সম্পাদক ও প্রকাশক : **রফিকুল বাসার**
এনার্জি বাংলা, শতাব্দী সেন্টার, ২৯২, ইনার সার্কুলার রোড, স্যুট # ১০-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এবং মাহির প্রিন্টার্স ফকিরেরপুল থেকে ছাপানো।
সম্পাদকীয় কার্যালয় : ২/৩-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন : ৮৮ ০১৫৫২৩১৫৭৪৫, ৮৮০২ ৭১৯১০৮৩ ফ্যাক্স : ৮৮০২ ৭১৯১৩৬২,
ই-মেইল : energybanglabd@gmail.com, www.energybangla.com, www.energybangla.com.bd